



কারাগারের রোজনামা - শেখ মুজিবুর রহমান

## কারাগারের জীবন

ভাষা আন্দোলন বঙ্গবন্ধু শুরু করেন ১৯৪৮ সালে। ১১ই মার্চ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন এবং গ্রেফতার হন। ১৫ই মার্চ তিনি মুক্তি পান। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সমগ্র দেশ সফর শুরু করেন। জনমত সৃষ্টি করতে থাকেন। প্রতি জেলায় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ফরিদপুরে গ্রেফতার করে। ১৯৪৯ সালের ২১শে জানুয়ারি মুক্তি পান। মুক্তি পেয়েই আবার দেশব্যাপী জনমত সৃষ্টির জন্য সফর শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবির প্রতি তিনি সমর্থন জানান এবং তাদের ন্যায্য দাবির পক্ষে আন্দোলনে অংশ নেন। সরকার ১৯৪৯ সালের ১৯শে এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। জুলাই মাসে তিনি মুক্তি পান। এইভাবে কয়েক দফা গ্রেফতার ও মুক্তির পর ১৯৪৯ সালের ১৪ই অক্টোবর আর্ম্যানিটোলা ময়দানে জনসভা শেষে ভুখা মিছিল বের করেন। দরিদ্র মানুষের খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল করতে গেলে আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন।

এবারে তাকে প্রায় দু'বছর পাঁচ মাস জেলে আটক রাখা হয়। ১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৪ সালের ৩০শে মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে করাচি থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে গ্রেফতার হন এবং ২৩শে ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তৎকালীন সামরিক সরকার কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এবারে প্রায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় বন্দি থাকার পর তাকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গোটেই গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬০ সালের ৭ই ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি আবার জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়ে তিনি ১৮ই জুন মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে তিনি আবার গ্রেফতার হন ।

১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের করে তাকে এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয় । পরবর্তী সময়ে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান ।

১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন । ১লা মার্চ তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন ।

তিনি যে ছয় দফা দাবি পেশ করেন তা বাংলার মানুষের বাঁচার দাবি হিসেবে করেন, সেখানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন যার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ।

একের পর এক দাবি নিয়ে জনগণের অধিকারের কথা বলার কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের প্রথম তিন মাসে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর, ময়মনসিংহ, সিলেট, খুলনা, পাবনা, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন শহরে আটবার গ্রেফতার হন ও জামিন পান । নারায়ণগঞ্জে সর্বশেষ মিটিং করে ঢাকায় ফিরে এসেই ৮ই মে মধ্য রাতে গ্রেফতার হন । তাঁকে কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে জীবন কাটাতে হয় । শোষকগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন, বাংলাদেশের মানুষের ন্যায্য দাবি তুলে ধরেছেন । ফলে যখনই জনসভায় বক্তৃতা করেছেন তখনই তার বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে গ্রেফতার করেছে সরকার ।

১৯৬৮ সালের ৩রা জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে ।

১৮ই জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে জেলগেট থেকে পুনরায় গ্রেফতার করে তাকে ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তায় বন্দি করে রাখে ।

পাঁচমাস পর ১৯শে জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচার কাজ শুরু হয় । ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত প্রবল চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা মুক্তিদানে বাধ্য হয় । কারণ, পূর্ববাংলার জনগণের সর্বাত্মক আন্দোলন এতই উত্তাল হয়ে উঠে যে, তাতে শুধু বিশাল গণঅভ্যুত্থানই না স্বৈরসামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাংলার জনগণের আপোষহীন অকুতোভয় নেতা ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল জয় লাভ করে মেজরিটি পায় । কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক শাসক সরকার গঠন করতে দেয় না । ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং বাংলার মানুষ তার কথায় সাড়া দেয় । তার নির্দেশেই এ দেশ পরিচালিত হতে থাকে । ৭ই মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ । হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার আহবান জানান । সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ মানসিকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয় । ২৫শে মার্চ কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং গণহত্যা শুরু করে ।

২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আহবান জানান । এই ঘোষণার সাথে সাথেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাকে ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায় এবং কারাগারে বন্দি করে রাখে । সমগ্র বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় । হানাদার বাহিনীর এই দমন পীড়ন ও পোড়ামাটি নীতি এবং গণহত্যা চালিয়ে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে । এরই একটি পর্যায়ে আমরা এক মাসে ১৯ বার জায়গা বদল করেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পাই নাই, আমরা ধরা পড়ে গেলাম ।

আমার মা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব, আমার ভাই লে. শেখ জামাল, বোন শেখ রেহানা, ছোট ভাই শেখ রাসেল, আমি ও

আমার স্বামী ড. ওয়াজেদকে ধানমন্ডি ১৮ নম্বর সড়কে একটি একতলা বাড়িতে বন্দি করে রাখা হলো ।

এক সময়ে পাকিস্তানি হানাদার শাসকগোষ্ঠী তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সবকিছু স্বাভাবিক চলছে ঘোষণা দিল । স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত সবই ঠিকঠাক আছে । সমগ্র বিশ্বকেই তারা দেখাতে চাইল যে এই ভূখণ্ডে ‘মিসক্রিয়োনট’দের তারা দমন করে ফেলেছে আর কোনো সমস্যা নাই, পাকিস্তান ‘খতরা’ থেকে বের হয়ে এসেছে, আল্লাহ পাকিস্তানকে রক্ষা করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেখাতে চেষ্টা করে বাংলাদেশের সবকিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে।

## ১ম বার খাতাগুলি উদ্ধার

এই সময়ে এক মেজর সাহেব এসে বলল, “বাচ্চা লোগ ‘সুকুল’ মে যাও” (বাচ্চারা স্কুলে যাও) । ড. ওয়াজেদ পাকিস্তান অ্যাটমিক এনার্জিতে চাকরি করতেন বলে তিনি নিয়মিত অফিসে যেতে পারতেন । ফলে বাইরে যাবার কিছু সুযোগ ছিল এবং যেহেতু এটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সাথে সম্পৃক্ত তাই যুদ্ধের সময়ও কিছু ছাড় পেতো। তাকে নিয়মিত অফিসে যেতে হতো আর সময়মতো ফিরতে হতো। তবে হানাদার বাহিনী সব সময় নজরদারিতে রাখত ।

যাহোক স্কুলে যাবে বাচ্চারা, জামাল, রেহানা আর রাসেল। আমি বললাম বই খাতা কিছুই তো নাই, কী নিয়ে স্কুলে যাবে আর যাবেই বা কীভাবে? জিজ্ঞেস করল বই কোথায়? বললাম, আমাদের বাসায়, আর সে বাসা তো আপনাদের দখলে আছে।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বাসা ।

বলল, “ঠিক হয় হাম লে যায়গে; তোম লোগ কিতাব লে আনা ।”

ওরা ঠিক করল জামাল, রেহানা, রাসেলকে নিয়ে যাবে যার যার বই আনতে । আমি বললাম, আমি সাথে যাব। কারণ একা ওদের সাথে আমি আমার ভাইবোনদের ছাড়তে পারি না । তারা রাজি হলো ।

আমার মা আমাকে বললেন, “একবার যেতে পারলে আর কিছু না হোক তোর আকবার লেখা খাতাগুলো যেভাবে পারিস নিয়ে আসিস ।” খাতাগুলো মার ঘরে কোথায় রাখা আছে তাও বলে দিলেন । আমাদের সাথে মিলিটারির দুইটা গাড়ি ও ভারী অস্ত্রসহ পাহারাদার গেল ।

২৫শে মার্চের পর এই প্রথম বাসায় ঢুকতে পারলাম। সমস্ত বাড়িতে লুটপাটের চিহ্ন, সব আলমারি খোলা, জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো । বাথরুমের বেসিন ভাঙা, কাচের টুকরা ছড়ানো, বীভৎস দৃশ্য!

অথবা লুট হয়েছে। কিছু তো নিতেই হবে। আমরা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাই, পাকিস্তান মিলিটারি আমাদের সাথে সাথে যায়। ভাইবোনদের বললাম, যা পাও বইপত্র হাতে হাতে নিয়ে নেও ।

আমি মায়ের কথামতো জায়গায় গেলাম । ড্রেসিং রুমের আলমারির উপর ডান দিকে আকবার খাতাগুলি রাখা ছিল, খাতা পেলাম। কিন্তু সাথে মিলিটারির লোক, কী করি? যদি দেখার নাম করে নিয়ে নেয়। সেই ভয় হলো । যাহোক অন্য বই খাতা কিছু হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে একখানা গায়ে দেবার কাঁথা পড়ে থাকতে দেখলাম, সেই কাঁথাখানা হাতে নিলাম, তারপর এক ফাঁকে খাতাগুলি ঐ কাঁথায় মুড়িয়ে নিলাম। সাথে দুই একটা বই ম্যাগাজিন পড়েছিল তাও নিলাম ।

আমার মায়ের হাতে সাজানো বাড়ির ধ্বংসস্তুপ দেখে বার বার চোখে পানি আসছিল। কিন্তু নিজেকে শক্ত করলাম। খাতাগুলি পেয়েছি। এইটুকু বড় সান্ত্বনা । অনেক স্মৃতি মনে আসছিল।

যখন ফিরলাম মায়ের হাতে খাতাগুলি তুলে দিলাম। পাকিস্তানি সেনারা সমস্ত বাড়ি লুটপাট করেছে, তবে রুলটানা এই খাতাগুলিকে গুরুত্ব দেয় নাই বলেই খাতাগুলি পড়েছিল ।

আকবার লেখা এই খাতার উদ্ধার আমার মায়ের প্রেরণা ও অনুরোধের ফসল। আমার আকবা যতবার জেলে যেতেন মা খাতা, কলম দিতেন লেখার জন্য । বার বার তাগাদা দিতেন । আমার আকবা যখন জেল থেকে মুক্তি পেতেন মা সোজা জেল গেটে

যেতেন আকবাকে আনতে আর আকবার লেখাগুলি যেন আসে তা নিশ্চিত করতেন। সেগুলি অতি যত্নে সংরক্ষণ করতেন।

খাতাগুলি তো পেলাম, কিন্তু কোথায় কীভাবে রাখব?

ঢাকার আরামবাগে আমার ফুফাতো বোন মাখন আপা থাকতেন। তার স্বামী মীর আশরাফ আলী, আকবার সঙ্গে কোলকাতা থেকেই রাজনীতি করতেন, যেভাবেই হোক তার কাছেই পাঠাবো সিদ্ধান্ত নিলাম। অবশেষে অনেক কষ্ট করে তার কাছে পাঠালাম। আমার বিশ্বাস তিনি যত্ন করে রাখবেন। কীভাবে যে পাঠিয়েছি সে কথা লিখতে গেলে আর এক ইতিহাস হয়ে যাবে, এ বিষয়ে পরে লিখব।

আমার ফুফাতো বোন পলিথিন ও ছালার চট দিয়ে খাতাগুলো বেঁধে তার মুরগির ঘরের ভিতরে চালের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে বুলিয়ে রেখেছিলেন, যাতে কখনও কেউ বুঝতে না পারে। কারণ পাকিস্তানি আর্মি সব সময় হঠাৎ হঠাৎ যে কোনো বাড়ি সার্চ করত। তবে ঐ বাড়ির সুবিধা ছিল যে আরামবাগ গলির ভিতর গাড়ি ঢুকতে পারত না।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের পর সেই খাতাগুলি আমার বোন ও দুলাভাই মায়ের হাতে পৌঁছে দেন। বৃষ্টির পানিতে কিছু নষ্ট হলেও মূল খাতাগুলি মোটামুটি ঠিক ছিল।

## ২য় বার খাতা উদ্ধার

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করা হয়। জীবিত কোনো সদস্য ছিল না। সকল সদস্যকেই এই বাড়িতে হত্যা করা হয়েছিল। আমার মা বেগম ফজিলাতুননেছা, ও লে. শেখ জামাল, ছোট ভাই শেখ রাসেল, কামাল ও জামালের নব পরিণীতা স্ত্রী সুলতানা ও রোজী, বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিল, পুলিশের দু'জন উচ্চতন কর্মকর্তাসহ ১৮ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এর পর থেকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি সরকারি দখলে থাকে।

আমি ও আমার ছোটবোন রেহানা দেশের বাইরে ছিলাম। ৬ বছর বাংলাদেশে ফিরতে পারি নাই। ১৯৮১ সালে যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করে আমি অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে দেশে ফিরে আসি।

দেশে আসার পর আমাকে বিএনপি সরকার আমাদের এই বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। বাড়ির গেটের সামনে রাস্তার উপর বসে মিলাদ পড়ি।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর বাড়িঘর লুটপাট করে সেনাসদস্যরা। কী দুর্ভাগ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সেনারা জাতির পিতাকে হত্যা করে। তিনি বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি। আর জাতির পিতা ও রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হলো ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে।

জেনারেল জিয়াউর রহমান তখন ক্ষমতা দখল করে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। মে মাসের ৩০ তারিখ জিয়ার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর ১২ই জুন বাড়িটা আমার হাতে হস্তান্তর করে। প্রথমে ঢুকতে পা খেমে গিয়েছিল। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

যখন হুঁশ হয়, আমাকে দিয়ে অনেকগুলি কাগজ সই করায়। কী দিয়েছে জানি না। যখন আমার পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে আসে তখন আমার মনে পড়ে আকবার লেখা খাতার কথা, আমি হেঁটে আকবার শোবার ঘরে ঢুকি। ড্রেসিং রুমে রাখা আলমারির দক্ষিণ দিকে হাত বাড়াই। ধূলিধূসর বাড়ি। মাকড়সার জলে ভরা তার মাঝেই খুঁজে পাই অনেক আকাশিষ্কৃত রুলটানা খাতাগুলি।

আমি শুধু খাতাগুলি হাতে তুলে নিই। আকবার লেখা ডায়েরি, মায়ের বাজার ও সংসার খরচের হিসাবের খাতা।

আব্বার লেখাগুলি পেয়েছিলাম। এটাই আমার সব থেকে বড় পাওয়া, সব হারাবার ব্যথা বুকে নিয়ে এই বাড়িতে একমাত্র পাওয়া ছিল এই খাতাগুলি। খুলনায় চাচির বাসায় খাতাগুলি রেখে আসি, চাচির ভাই রবি মামাকে দায়িত্ব দেই, কারণ ঢাকায় আমার কোনো থাকার জায়গা ছিল না, কখনো ছোট ফুফুর বাসা, কখনো মেজো ফুফুর বাসায় থাকতাম।

## লেখাগুলি প্রকাশ করার কাজ শুরু

খাতাগুলি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিই। ড. এনায়েতুর রহিমের সঙ্গে আমি ও বেবী বই নিয়ে কাজ করতে শুরু করি, তিনি আমেরিকার জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। তার পরামর্শমতো কাজ করি।

খাতাগুলি জেরোব্র কপি করে ও ফটোকপি করে একসেট রেহানার কাছে রাখি। বেবী টাইপ করানোর দায়িত্ব নেয়।

ড. এনায়েতুর রহিম ও তাঁর স্ত্রী জয়েস রহিম অনুবাদ করতে শুরু করেন। তিনি সবগুলি খাতা অনুবাদ করে দেন।

কিন্তু ২০০২ সালে তিনি হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করেন। আমাদের কাজ থেমে যায়।

এরপর ঐতিহাসিক প্রফেসর সালাহউদ্দীন সাহেবের পরামর্শে কাজ শুরু করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর সামসুল হুদা হারুন, বাংলা একাডেমির শামসুজ্জামান খান, বেবী মওদুদ ও আমি বসে কাজ শুরু করি। নিনু বাংলায় কম্পিউটার টাইপ করে দেয়, রহমান (রমা) কে দিয়ে ফটোকপি করার কাজ করি। বাড়িতেই আলাদা ফটোকপি মেশিন ক্রয় করি।

২০০৭ সালে বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা দেয়া হয় এবং আমাকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দি করে। ২০০৮ পর্যন্ত বন্দি ছিলাম। আমি বন্দি থাকা অবস্থায় প্রফেসর ড. হারুন মৃত্যুবরণ করেন। এই খবর পেয়ে আমি খুব দুঃখ পাই এবং চিন্তায় পড়ে যাই যে কীভাবে আব্বার বইগুলো শেষ করব। জেলখানায় বসেই আমি অসমাপ্ত আত্মজীবনী ভূমিকাটা লিখে রাখি। ২০০৮ সালে মুক্তি পেয়ে আবার আমরা বই প্রকাশের কাজে মনোনিবেশ করি।

এই খাতাগুলির মধ্য থেকে ইতিমধ্যে অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশ করা হয়েছে। সেই খাতাগুলি ফেরত পাবার ঘটনা আমি ঐ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছি।

এরপর আমরা আব্বার ডায়েরি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, স্মৃতিকথা এবং চীন ভ্রমণ নিয়ে কাজ শুরু করি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার উপর প্রফেসর এনায়েতুর রহিম সাহেব বেশ কিছু গবেষণা করে যান এবং সেটাও প্রকাশের জন্য আমরা কাজ করতে থাকি।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ২০১৩ সালে বেবী মওদুদ মৃত্যুবরণ করেন। আমি বড় একা হয়ে যাই। যাহোক বেবী বেঁচে থাকতেই আমরা অসমাপ্ত আত্মজীবনী যেটা ড. ফকরুল ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছেন সেটা আমরা প্রকাশ করেছি। যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। আমরা ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত লেখা ডায়েরি বই আকারে প্রকাশ করবার প্রস্তুতি নিয়েছি। অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রতিটি লেখা বারবার পড়ে সংশোধন করে দিয়েছেন।

## কারাগারের রোজানামচা

বর্তমান বইটার নাম ছোট বোন রেহানা রেখেছে-‘কারাগারের রোজানামচা’। এতটা বছর বুকে আগলে রেখেছি যে অমূল্য সম্পদ-আজ তা তুলে দিলাম বাংলার জনগণের হাতে।

ড. ফকরুল আলমের অনুবাদ করে দেওয়া ইংরেজি সংস্করণের কাজ এখনও চলছে।

১৯৬৬ সালে ৬ দফা দেবার পর বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা গ্রেফতার হন। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বন্দি থাকেন। সেই সময়ে কারাগারে প্রতিদিনের ডায়েরি লেখা শুরু করেন। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত লেখাগুলি এই বইয়ে প্রকাশ করা হলো।

একই সাথে আর একটি খাতা খুঁজে পাই-তারও ইতিহাস রয়েছে। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১২ই অক্টোবর আক্বাকে গ্রেফতার এবং তার রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেয়। এরপর ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন কারাগার থেকে মুক্তি পান তখন তাঁর লেখা খাতাগুলির মধ্যে দুইখানা খাতা সরকার বাজেয়াপ্ত করে। এই খাতাটা তার মধ্যে একখানা, যা আমি ২০১৪ সালে খুঁজে পেয়েছি। SB'র কাছ থেকে পাওয়া এই খাতাটা। S. B. (Special Branch) এর অফিসাররা খুবই কষ্ট করে খাতাখানা খুঁজে দিয়েছেন, তাই তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই খাতাটা আরও আগের লেখা। সেই বন্দি থাকা অবস্থায় এই খাতাটায় তিনি জেলখানার ভিতরে অনেক কথা লিখেছিলেন। এই লেখার একটা নামও তিনি দিয়েছিলেন :

থানা বাটি কন্সল  
জেলখানার সম্বল।

এই লেখার মধ্য দিয়ে কারাগারের রোজনামাচা পড়ার সময় জেলখানা সম্পর্কে পাঠকের একটা ধারণা হবে। আর এই লেখা থেকে জেলের জীবনযাপন এবং কয়েদিদের অনেক অজানা কথা, অপরাধীদের কথা, কেন তারা এই অপরাধ জগতে পা দিয়েছিল সেসব কথা জানা যাবে।

জেলখানায় সেই যুগে অনেক শব্দ ব্যবহার হতো। এখন অবশ্য সেসব অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তারপরও মানুষ জানতে পারবে বহু অজানা কাহিনি।

৬ দফা দাবি পেশ করে যে প্রচার কাজ তিনি শুরু করেছিলেন। সেই সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

তাঁর গ্রেফতারের পর তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পত্র-পত্রিকার অবস্থা, শাসকদের নির্যাতন, ৬ দফা বাদ দিয়ে মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা ইত্যাদি বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন। মানুষের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন ও সংগ্রাম তিনি করেছেন যার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা অর্জন।

বাংলার মানুষ যে স্বাধীন হবে এ আত্মবিশ্বাস বার বার তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। এত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পৃথিবীর আর কোনো নেতা ভবিষ্যদবাণী করতে পেরেছেন কিনা আমি জানি না।

ধাপে ধাপে মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। উজীবিত করেছেন।

৬ দফা ছিল সেই মুক্তি সনদ, সংগ্রামের পথ বেয়ে যা এক দফায় পরিণত হয়েছিল, সেই এক দফা স্বাধীনতা। অত্যন্ত সুচারুরূপে পরিকল্পনা করে প্রতিটি পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সামরিক শাসকগোষ্ঠী হয়তো কিছুটা ধারণা হার মানতে বাধ্য হয়েছিল।

৬ দফাকে বাদ দিয়ে কারা ৮ দফা করে আন্দোলন ভিন্নখাতে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছিল, সে কাহিনিও এই লেখায় পাওয়া যাবে।

দীর্ঘ কারাবাসের ফলে তাঁর শরীর যে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে যেত। তিনি সে কথা আমাদের কখনো জানতে দেন নাই। আমি এই ডায়েরিটা পড়বার পর অনেক অজানা কথা জানার সুযোগ পেয়েছি। ভীষণ কষ্ট হয় যখন দেখি অসুস্থ-সেবা করার কেউ নেই, কারাগারে একাকী বন্দি অর্থাৎ Solitary confinement. কখনো কোনো বন্দিকে এক সপ্তাহের বেশি একাকী রাখতে পারে না। যদি কেউ কোনো শাস্তি পায়, সেই শাস্তি হিসেবে এই এক সপ্তাহ রাখতে পারে। কিন্তু বিনা বিচারেই তাকে একাকী কারাগারে বন্দি

করে রেখেছিল। তার অপরাধ ছিল তিনি বাংলার মানুষের অধিকারের কথা বার বার বলেছেন।

বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চেয়েছেন; ক্ষুধা, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে উন্নত জীবন দিতে চেয়েছেন।

গাছপালা, পশু-পাখি, জেলখানায় যারা অবাধে বিচরণ করতে পারত। তারাই ছিল একমাত্র সাথি। এক জোড়া হলুদ পাখির কথা কী সুন্দরভাবে তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। একটা মুরগি পালতেন, সেই মুরগিটা সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। ঐ মুরগিটার মৃত্যু তাকে কতটা ব্যথিত করেছে সেটাও তিনি তুলে ধরেছেন অতি চমৎকারভাবে।

কারণারে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে তাঁর উদ্বেগ-দলের প্রতিটি সদস্যকে তিনি কতটা ভালোবাসতেন, তাদের কল্যাণে কত চিন্তিত থাকতেন সেকথাও অকাতরে বলেছেন। তিনি নিজের কষ্টের কথা সেখানে বলেন নাই। শুধু একাকী থাকার কথা বার বার উল্লেখ করেছেন।

জেলখানায় পাগলা গারদ আছে তার কাছেরই সেলে তাকে বন্দি রাখা হয়েছিল। সেই পাগলদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না তাদের আচার-আচরণ অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে তিনি তুলে ধরেছেন। এদের কারণে রাতের পর রাত ঘুমাতে পারতেন না। কষ্ট হতো। কিন্তু নিজের কথা না বলে তাদের দুঃখের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। মানবদরদি নেতা ছাড়া বোধহয় এই বর্ণনা দেওয়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

কী অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন চলত তা তিনি বুঝতেন, কিন্তু আমার মায়ের ওপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। আমার দাদা-দাদি সময় সময় ছেলেকে উৎসাহ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন। বাবা-মায়ের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ এই লেখায় পাওয়া যায়। যত বয়সই হোক আর যত বড় নেতাই তিনি হন, তিনি যে বাবা মায়ের আদরের ‘খোকা’ সে কথাটা আমরা উপলব্ধি করি যখন তিনি বাবা মায়ের কথা লিখেছেন। গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পিতা-মাতার প্রতি প্রদর্শন খুব কম লোক দেখাতে পারেন। তার উপর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে জেল থেকে বের হয়ে বাবা মাকে দেখতে পারবেন। কিনা, কারণ তাদের বয়স হয়েছে। সবকিছু ছাপিয়ে দেশ ও দেশের মানুষ ছিল সর্বোচ্চ স্থানে। আর এই দায়িত্ব পালনে পরিবারের সমর্থন সবসময় তিনি পেয়েছেন। এত আত্মত্যাগ করেছেন বলেই তো আজ পৃথিবীর বুকে বাঙালি জাতি একটা রাষ্ট্র পেয়েছে। এই তুলনাহীন অর্জনের জন্যেই তিনি আজ এই জাতির পিতা। জাতি হিসেবে আতপরিচয় পেয়েছে। বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। একাকী একটা ঘরে দীর্ঘদিন বন্দি থাকেন। একটা ঘর গাঢ় লাল রঙের মোটা পর্দা, কাচে লাল রং করা, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লাইট চক্ৰিশ ঘন্টা জ্বালানো থাকা অবস্থায় দীর্ঘদিন বন্দি থাকতে হয়েছে। এটাও চরম অত্যাচার, যা দিনের পর দিন তার উপর করা হয়েছিল।

পাঁচ মাস পর একখানা খাতা পান লেখার জন্য। তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন যে তাকে এমনভাবে একটি ঘরে বন্দি করে রেখেছিল যে রাত কি দিন তাও বুঝতে পারতেন না ও দিন তারিখ ঠিক করতে পারতেন না। তাই এই খাতায় কোনো দিন তারিখ দিয়ে তিনি লেখেননি। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কুর্মিটোলা নিয়ে যাবার বর্ণনা। বন্দিখানার কিছু কথা তিনি লিখেছেন, বিশেষ করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করা হয়েছিল যে মামলায় অভিযোগ ছিল তিনি সশস্ত্র বিপ্লব করে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন-এতে আরও ৩৪ জন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাকেও জড়িত করা হয়েছিল।

সেই সময় বন্দি অবস্থায় যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো অর্থাৎ ইন্টারোগেশন করা হতো সে কথাও লিখেছেন। এই কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছিলেন বাংলার সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য। জনগণের জন্যই সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন, কষ্ট করেছেন। মনের জোর ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাকে এত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছিলেন।

প্রথম খাতাটা ১৯৬৬ সালে লেখা। আর দ্বিতীয়টা ১৯৬৭ সালে লেখা। এই সাথে আর কয়েকটি খাতায় ঐ সময়ের কথা লেখা ছিল সেগুলি সব ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হওয়ার পর ঘরের বাইরে কোর্টে নিয়ে যেত। কাঠগড়ায় সকল আসামিকে দেখতে পেয়েছিলেন। সকলের আইনজীবী ও পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত থাকতে পারতেন। পরিবারের সদস্য কতজন যেতে পারবে সে সংখ্যা নির্দিষ্ট করে পাশ দেয়া হতো। যারা পাশ পেতো তারাই ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে কোর্টে যেতে পারতো। কারণ কোর্ট ক্যান্টনমেন্টের ভিতরেই বসতো।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যে খাতা দেওয়া হতো তার পাতাগুলি গুনে নাম্বার লিখে দিতো। প্রতিটি খাতা সেন্সর করে কর্তৃপক্ষের সাই ও সিল দিয়ে দিত।

এই লেখাগুলি ছাপানোর জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে শামসুজ্জামান খান, বাংলা একাডেমির ডিজি সার্বক্ষণিক কন্ট্রল করেছেন। বার বার লেখাগুলো পড়ে প্রুফ দেখে দিয়েছেন বার বার সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। তার পরামর্শ আমার জন্য অতি মূল্যবান ছিল। তার সহযোগিতা ছাড়া কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। বাংলা একাডেমিকেই বইটি ছাপানোর জন্য দেয়া হয়েছে। সেলিমা, শাকিল, অভি। সর্বক্ষণ সহায়তা করেছে। তাদের সহযোগিতায় কাজটা দ্রুত সম্পন্ন করতে পেরেছি। তাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বইয়ের মূল প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে ছাপানো পর্যন্ত যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাঠকদের হাতে বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই ডায়েরির লেখাগুলি যে তুলে দিতে পেরেছি। তার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। অসমাপ্ত আত্মজীবনী বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পথপ্রদর্শক। ভাষা আন্দোলন থেকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা অর্জনের সোপানগুলি যে কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এগুতে হয়েছে তার কিছুটা এই কারাগারের রোজনামচা বই থেকে পাওয়া যাবে। স্বাধীন বাংলাদেশ ও স্বাধীন জাতি হিসেবে মর্যাদা বাঙালি পেয়েছে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেই সংগ্রামে অনেক ব্যথা বেদনা, অশ্রু ও রক্তের ইতিহাস রয়েছে। মহান ত্যাগের মধ্য দিয়ে মহৎ অর্জন করে দিয়ে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই ডায়েরি পড়ার সময় চোখের পানি বাধ মানেন না। রেহানা, বেবী ও আমি চোখের পানিতে ভেসে কাজ করেছি। আজ বেবী নেই তার কথা বার বার মনে পড়ছে। বাংলা কম্পিউটার টাইপ করে নিনু আমার কাজটা সহজ করে দিয়েছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে কাজ করেছে তার আন্তরিকতা ও একাগ্রতা আমার কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে, তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নিনু যখন টাইপ করেছে তারও চোখের পানি সে ধরে রাখতে পারেনি। অনেকসময় কম্পিউটারের কী বোর্ড তার চোখের পানিতে সিক্ত হয়েছে। আমরা যারাই কাজ করেছি। কেউ আমরা চোখের পানি না ফেলে পারিনি।

তার জীবনের এত কষ্ট ও ত্যাগের ফসল আজ স্বাধীন বাংলাদেশ। এ ডায়েরি পড়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ তাদের স্বাধীনতার উৎস খুঁজে পাবে।

আমার মায়ের প্রেরণা ও অনুরোধে আক্সা লিখতে শুরু করেন। যতবার জেলে গেছেন আমার মা খাতা কিনে জেলে পৌঁছে দিতেন, আবার যখন মুক্তি পেতেন তখন খাতাগুলি সংগ্রহ করে নিজে সযত্নে রেখে দিতেন। তাঁর এই দূরদর্শী চিন্তা যদি না থাকত তাহলে এই মূল্যবান লেখা আমরা জাতির কাছে তুলে দিতে পারতাম না। বার বার মায়ের কথাই মনে পড়ছে।

**শেখ হাসিনা**

**২৫শে জানুয়ারি ২০১৭**

প্রকাশক: বাংলা একাডেমি

মূল্য: ৪০০ টাকা

**সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য**  
**MyMahbub.Com**